International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-V, September 2024, Page No.48-55
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i5.2024.48-55

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নারীর আখ্যান

তানজিনা জাহান
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, বাংলাদেশ

Abstract:

Rabindranath Tagore's literary work depicts the diverse and evolved form of women's life. In his numerous short stories, the position of women in the patriarchal society, the discriminatory treatment of women and at the same time the story of women's protest and self-establishment are revealed. Rabindranath's hands have given Bengali literature countless female characters who are uncompromising on the question of ethics. His female characters are independent-minded and have strong personalities. Rabindra's short stories draw our attention to the individualism of women of various classes and professions and women's protest against various inconsistencies in society. Rabindranath saw the life of women in this country with his insight. Compared to other branches of literature, Rabindra's short stories have given the greatest expression of women's protest ideas. It is through protest and resistance that the opposing forces of society are defeated and social reforms are achieved. Rabindranath's six famous short stories are 'Denapaona', 'Shasti', 'Haimanti', 'Strir Patra', 'Aparichita' and 'Payala Number'. The heroines of the stories are Nirupama, Chandara, Haimanti, Mrinal, Kalyani and Anila respectively. These six female characters are a burning flame in the face of society's so-called marriage customs, family religion, dowry system, in-laws' tyranny and oppression. Women who are vocal and protest against injustice awaken the spirit of protest in the hearts of women of all classes of society. Women protestors inspire to raise the status of women in society. In the present article, an attempt has been made to analyze the nature of protest spirit against the social customs of female characters in Rabindranath Tagore's mentioned six short stories.

Keywords: Woman, Protester, Social, Custom, Patriarchy, Renovation, Release.

বাংলা সাহিত্যের সার্থক ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) নারীমুক্তি থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও ধর্মীয় পটভূমিতে তাঁর গল্পগুলো লিখেছেন। “রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও মননে গতিধারা সঞ্চারিত হয়েছে বিচিত্র পথ ধরে।” (মোরশেদ, ২০০৭: ৩৭) রবীন্দ্র সাহিত্যের বিচিত্র পথের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক পথিক হলো নারী। নারীকে অবলা থেকে সবলা হওয়ার পথ দেখিয়েছেন তিনি। সামাজিক প্রথার বিষবাষ্পে যখন কল্যাণময়ী নারীর অবমাননা হয়, রবীন্দ্রনাথের অতি সংবেদনশীল মন তখন ব্যথিত হয়। সেজন্যই তিনি তাঁর অমর লেখনীর জাদুস্পর্শে অবলা নারীদের সামাজিক এই প্রথার

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর করে অঙ্কিত করেন। তাঁর গল্পের নারীরা বঞ্চনার শিকার হয়ে ধীরে ধীরে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য:

> ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের অধিকাংশ পরিচালিত হয়েছিল নারীর প্রতি লাঞ্ছনা আর নিগ্রহের প্রতিবাদে। সাহিত্যে তার ছাপ পড়েছে বিচিত্র রূপে। রবীন্দ্রনাথও সচেতনভাবে তাঁর সাহিত্যে এই সব সমস্যাকে স্থান দিয়েছিলেন। (উদ্দীন, ১৯৭৮: ৮৪)

আমাদের দেশের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী থেকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যে পর্যায় আরম্ভ হয়, সেই যুগের জাতীয় চেতনার গুরুত্বপূর্ণ একজন প্রতিনিধি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর তাই, রবীন্দ্র ছোটগল্পের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সমাজ অভিজ্ঞতা ও তাঁর মানস প্রকৃতির উপর নির্ভরতা থেকে। রবীন্দ্র-প্রতিভা বিচিত্র শোভার দীপ্তিতে ভাস্বর। "ছোটগল্প তাঁর সেই বিচিত্রমুখী প্রতিভার অতি স্মরণীয় অভিজ্ঞান।" (দাশ, ১৯৮৩: ৭৫) রবীন্দ্র ছোটগল্পে প্রাণবন্ত রূপে ধরা দিয়েছে মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অজস্র রূপ, দৈনন্দিন জীবনযাপন, সম্পর্কের জটিল সমীকরণ, জন্ম-মৃত্যু, প্রেম-ভালোবাসা, প্রকৃতি, অত্যাচার-অনাচার ও নিপীড়নের বহুমুখী চিত্র। মানবসমাজের গভীরে প্রবেশের যে গভীরতর ইচ্ছা কবি হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছিল তারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর ছোটগল্পগুলোতে। এক্ষেত্রে সমালোচকের উক্তিটি স্মরণযোগ্য:

> মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের দৈনন্দিন জীবনের রূপ, একান্নবর্তী পরিবারের সমস্যা, সমস্যাকণ্টকিত কন্যার পিতার বক্ষবিদারী বেদনা, বাঙালী জীবনের প্রথা-সংস্কার, বিশ্বাস, জটিল-মনস্তত্ত্ব, প্রকৃতির সাথে মানবচিত্তের সংযোগ, অতি-প্রাকৃত পরিবেশ প্রভৃতি নানা বিষয়াবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পপ্রবাহ হয়েছে উৎসারিত। আপাতদৃষ্টিতে বৈচিত্র্যবিহীন বাঙালী জীবনের অতল-গভীর থেকে উদ্ধার করেছেন তিনি মুক্তার মতো বিচিত্রবিভবপূর্ণ ভাবধারা এবং আপন প্রতিভার আলোকস্পর্শে ব্যঞ্জনা ও বাণীর প্রাসাদ সৃষ্টি করে উপহার দিয়েছেন বাঙালী তথা বিশ্বের রসজ্ঞ পাঠক সাধারণকে। (চক্রবর্তী, ১৩৮৯: ৩২)

"ছোটগল্পের উদ্ভবের পশ্চাতে একটা বিশেষ সামাজিক পরিবেশ, মানসিকতা ও চাহিদা বিদ্যমান।" (উদ্দীন, ১৯৭৮: ৩) ফলস্বরূপ মানবসমাজের প্রতি ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সামাজিক প্রথা ও এই প্রথার বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ বারে বারে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সার্থক সামাজিক গল্প *দেনাপাওনা* (১৮৯১)। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'হিতবাদী' পত্রিকায়। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন পণ প্রথার কুফল ও বাঙালি ঘরের বিষময় বেদনার রুদ্ধ এক ইতিহাসকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিবাহের মতো পবিত্র সামাজিক সংস্কারকে কেন্দ্র করে জঘন্যতম ব্যবসা করার দৃশ্য এবং এর ভয়াবহ পরিণতির আঁচ পাওয়া যায় এই গল্পে। সমাজ-সংসারের নির্মমতার মধ্য দিয়ে গল্পটিতে ফুটে উঠেছে যৌতুকের দায়ে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিরুপমার মৃত্যুর কথা। নিরুপমা মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে উঠে আসা অসহায় এক নারী। কন্যাদায়গ্রস্থ দরিদ্র পিতা রামসুন্দর মিত্র আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও বেশি পণ দেওয়ার সম্মতি দিয়ে রায়বাহাদুরের একমাত্র ম্যাজিস্ট্রেট পুত্রের সাথে নিরুপমার বিয়ে স্থির করে। কিন্তু বিয়ের পর পণের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে শ্বশুরবাড়িতে নিরুপমার জীবনে নেমে আসে অর্থলোভী শ্বশুর-শাশুড়ি কর্তৃক মানসিক বিড়ম্বনা। প্রস্তাবিত পণের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় মেয়েকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে নিজের কাছে নিয়ে

আসতে পারে না রামসুন্দর। শ্বশুরালয়ের তীব্র মানসিক অত্যাচার, উপেক্ষা আর অযত্নে থেকেও নিরুপমা তার পিতাকে পণের টাকা দিতে নিষেধ করেছে। প্রবল আত্মসম্মানবোধে উদ্বুদ্ধ বিদ্রোহিনী নিরুপমার পিতার প্রতি আবেদন, “বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবেনা, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।”(ঠাকুর, ২০১১: ১৬) কিন্তু বাবার পিতৃহৃদয় মেয়ের এই কথায় শান্ত হতে পারেনি। নিরুপমাকে পিতৃগৃহে নিয়ে যেতে রামসুন্দর শেষপর্যন্ত ভিটেবাড়ি বিক্রি করে রায়বাহাদুরের সমস্ত ঋণ শোধ করতে এসেছিল। প্রকৃতার্থেই এক বাঙালি পিতা চেয়েছিল কন্যার মুক্তি আর কল্যাণ। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> ... কন্যার বিয়ের জন্য অর্থ যোগান দিতে গিয়ে বহু পরিবার ধ্বংস হয়েছিল। এই ব্যাধি সমাজে রূপান্তর গ্রহণ করে দুর্দমভাবেই প্রচলিত ছিল এবং আছে। শতাব্দীর শেষদিকে পণ-প্রথা বাঙালি সমাজে এক নির্লজ্জ ও হৃদয়হীন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। উচ্চশিক্ষিত অভিজাত বাঙালি ঘরে এই কুপ্রথার দাপটে অনেক পরিবারে নেমে এসেছিল শোকার্ত অন্ধকার। (উদ্দীন, ১৯৭৮: ৮৪)

এই অন্ধকার রামসুন্দরের পরিবারকেও গ্রাস করেছিল। এই অন্ধকারের বিপরীতে আলো প্রজ্বলনের জন্যই রবীন্দ্রনাথ নিরুপমাকে শাশ্বত বাঙালি নারীর খোলস থেকে বের করে এনেছেন। যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে করিয়েছেন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। নিরুপমার প্রতিবাদী ভাষ্য:

> “টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম! না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তা ছাড়া আমার স্বামী তো এ টাকা চান না।” (ঠাকুর, ২০১১ : ১৬)

সমাজের দুষ্ট ক্ষত পণ প্রথার বিরুদ্ধে নিরুপমার এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নারী ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘটিয়েছেন। শ্বশুরবাড়িতে বিনা চিকিৎসায়, অবহেলায়, অনাদরে, উপেক্ষায় ও নিজের প্রতি যত্ন না নেওয়ার ফলে নিরুপমা ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নিরুপমার প্রতি এই নির্যাতন আমাদের মনে করিয়ে দেয় বাঙালি ঘরে শাশুড়ি কর্তৃক বধূ নির্যাতনের ভয়াবহ ও বেদনাময় চিত্রের কথা। গল্পটি পণ প্রথার নির্মমতা ও এর কঠিন চাকায় পিষ্ট এক বিদ্রোহী নারীর জীবনের বেদনাময় আলেখ্য। “অর্থমূল্যে কেনা মর্যাদার বিরুদ্ধে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুপণে নিরুপমার এই বিদ্রোহই গল্পের আশ্চর্য প্রাপ্তি।” (দাশগুপ্ত, ১৯৯০: ৬২) এই বিদ্রোহই নিরুপমা চরিত্রকে উজ্জ্বলতা দান করেছে। সমাজের নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তির জন্য নারীর এই প্রতিবাদ ও সংগ্রাম অত্যন্ত গৌরবের।

নারীর অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের *শাস্তি* (১৮৯৩) গল্পে। “গল্পের আখ্যান সামাজিক, প্রশ্ন মানবিক।” (উদ্দীন, ১৯৭৮: ১৩৩) এই গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘সাধনা’ পত্রিকায়। গল্পের নায়িকার নাম চন্দরা। দুখিরাম, ছিদাম এবং তাদের স্ত্রী রাধা ও চন্দরাকে নিয়ে অভাবের সংসার তাদের। একদিন ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাজ থেকে বাড়িতে ফিরে দুখিরাম রাধার কাছে ভাত চাইলে রাধা কর্কশ স্বরে বলে “ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।” (ঠাকুর, ২০১১: ৯৫) “এই বেদনাময় পরিস্থিতি রাধা হত্যার ইন্ধন যুগিয়েছিল।” (উদ্দীন, ১৯৭৮: ১৩৩) দুখিরাম একথা সহ্য করতে না পেরে রাধার মাথায় দা দিয়ে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে রাধা মারা যায়। রাধা মারা যাওয়ার পর ছিদাম ভাইকে বাঁচানোর জন্য সমস্ত দোষ চন্দরার উপর চাপিয়ে দেয়। আর তখন “... সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার

স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল।” (ঠাকুর, ২০১১: ৯৬) পুরুষশাসিত সমাজের গর্হিত একটি অপরাধ নারীর উপর চাপিয়ে দেয়া হলো। সেজন্য অভিমানাহত চন্দরাও স্বীকারোক্তি দিয়েছে: “হাঁ, আমি খুন করিয়াছি।” (পৃ. ৯৭) চন্দরার কাছে তুচ্ছ জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক বেশি সম্মানের। তাই মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে সে বৈরী জগতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ফাঁসির আদেশ হওয়ার পর স্বামী তাকে দেখতে চাইলে চন্দরা একটি কথাই বলেছিল : “মরণ!-” (পৃ. ৯৮) এই একটি শব্দের মাধ্যমে চন্দরা প্রতিবাদ জানিয়েছে স্বামীর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও এই সমাজের স্বার্থপরতা ও নীচতার বিরুদ্ধে চন্দরার প্রতিবাদ তাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মহিমান্বিত করেছে।

তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থানের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় *হৈমন্তী* (১৯১৪) গল্পে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় মাসিক ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায়। নারী অবমাননার বিরুদ্ধে সফল প্রতিবাদী গল্প এটি। তৎকালীন সমাজে বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথা প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। গল্পের নায়িকা হৈমন্তীর বয়স বেশি হওয়া সত্ত্বেও পণের টাকার লোভে অপুর বাবা অপুর সাথে হৈমন্তীর বিয়ে দেয়। হৈমন্তীর সতেরো বছর বয়সটাই বিপদের কাল হলো শেষ পর্যন্ত। গৌরিশংকর বাবুর লাখ টাকার গুজবের পরিবর্তে অপুর বাবা-মা যখন জানতে পারল হৈমন্তীর পিতা উচ্চসুদে ঋণ নিয়ে মেয়ের বিয়ের পণ মিটিয়েছে তখন থেকেই শ্বশুরবাড়িতে হৈমন্তীর প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখানো শুরু হয়। আত্মীয়রা হৈমন্তীর বয়স জানতে চাইলে সে শাশুড়ির নির্দেশমতো বয়স কম বলে মিথ্যা বলেনি। তখন অপুর মা রেগে বলে উঠে: “তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগার।” (ঠাকুর, ২০১১: ৩২২) আর তখনই “হৈম চমকিয়া কহিল, “বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।” (পৃ. ৩২২) হৈমন্তীর এমন কথা শুনে অপুর মা চড়া গলায় উত্তর দেয়: “তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?” (পৃ. ৩২২) সেই মুহূর্তেই হৈমন্তীর সুতীক্ষ্ণ প্রতিবাদ: “আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।” (পৃ. ৩২২) এই একটি মাত্র বাক্যের মধ্য দিয়ে সুশিক্ষা, রুচিবোধ ও স্নিগ্ধ মনোভাবসম্পন্ন হৈমন্তী চরিত্রের প্রতিবাদী সত্তাটি প্রকাশ পায়।

হৈমন্তীর পিতা শিক্ষিত ছিল। হৈমন্তী তার পিতার নিকট থেকেই মহৎ গুণগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করে সুশিক্ষায় স্বশিক্ষিত হয়েছিল। এই সুশিক্ষার জন্যই হৈমন্তীর মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের স্ফূরণ ঘটে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধই তাকে সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তুলেছে। পিতা গৌরিশংকরের মতোই বলিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা ও সত্যবাদিতার প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও শ্বশুর-শাশুড়ির নীচতা ও অবহেলার শিকার হয়ে হৈমন্তী স্বেচ্ছায় তিলে-তিলে আত্মহত্যার পথকেই বেছে নেয়। হৈমন্তীর পিতা হৈমন্তীর শ্বশুরবাড়িতে তাকে দেখতে এলে অভিমান করে সে তার পিতাকে বলে: “বাবা, আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।” (পৃ. ৩২৪) মানসিক যন্ত্রনা আর আঘাতে বিধ্বস্ত হৈমন্তীর এই প্রতিবাদী বক্তব্যে সহজেই বোঝা যায় পিতার অপমান মূলত তারই অপমান। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে একদিকে যেমন যৌতুকের বিরুদ্ধে, মিথ্যার বিরুদ্ধে রুচিবোধসম্পন্ন হৈমন্তীর প্রতিবাদী রূপ প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে আবার হৈমন্তীর উপর শ্বশুর বাড়ির অত্যাচারের প্রতি অপুর নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে নিজে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সেজন্যই রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিতভাবেই “হৈমন্তী” নামটি গল্পে উল্লেখ করেননি। হৈমন্তীর প্রতিবাদ নিজের অস্তিত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ। তার প্রতিবাদ গুণে ধরা সমাজের কুপ্রথা ও সমাজের মানুষের নির্মমতার বিরুদ্ধে জ্বলন্ত এক দলিল।

রবীন্দ্রনাথের *স্ত্রীরপত্র* (১৯১৪) গল্পটি স্বামীর কাছে লেখা স্ত্রীর একটি পত্র। গল্পটি পত্রাকারে লিখিত। এই গল্পে নায়িকা মৃণালের নারী-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের বিকাশ ঘটেছে চমৎকারভাবে। মৃণাল সম্পর্কে সমালোচকের ভাষ্য:

> মৃণাল আগাগোড়া বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি। এই বিদ্রোহ স্বামীর পরিবারের নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে যেমন, তেমনি রুগ্ন মধ্যযুগীয় পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ-সমাজের বিরুদ্ধেও। বিন্দুর প্রতি সকলের অমানবিক ব্যবহার দেখে মৃণাল মধ্যযুগীয় মূল্যবোধহীন সমাজের চেহারাটা উপলব্ধি করেছে। এই জন্য সবরকম সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তার জেহাদ। মৃণাল বিন্দুকে দেখে উপলব্ধি করেছে সংসারে নারীদের অবস্থান কোথায়! এই জন্যই পত্নীত্ব থেকে নারীত্বের মহিমায় তার মুক্তিসন্ধান। (চট্টোপাধ্যায়: ৭১৫)

সন্তানহীনা মৃণালের পরিচয় হলো একটি বৃহৎ পরিবারের মেজো বউ সে। বিদ্রোহিনী মৃণাল দীর্ঘ পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবনকে ছিন্ন করে দিতে চেয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজের স্বার্থপরতা, নিজ পরিবারের কর্তব্য ও দেনাপাওনার সীমাবদ্ধতা থেকে মৃণাল মুক্তি চেয়েছিল। বিন্দুর সঙ্গে মৃণালের সম্পর্ক নিবিড় হওয়ার পর সে আগাগোড়া বিদ্রোহের প্রতিমূর্তিতে পরিণত হয়। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রূঢ়তা এবং এসবের বিপরীতে নারীর সাহসী প্রতিবাদী রূপ। মূলত "স্ত্রীর পত্র' সামাজিক লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নারীর বিদ্রোহ।" (ঘোষ, ২০১৪: ৮০) গল্পের মুখ্য চরিত্র মৃণালের জীবন সঠিক গতিতে চলমান ছিল না। ছোটবেলা থেকেই সে সমাজের আরক্ত চক্ষুর শিকার। অপরদিকে বিন্দুর বড় বোন স্বামী সংসারে অবহেলিত। পুরুষতন্ত্র তার মস্তিষ্কে ভর করে আছে। আর তাই নিজের রক্তের বোনকে নিজের বাড়িতে দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করেছে। বিন্দুকে পাগল স্বামীর সংসারে পাঠানোর বিরুদ্ধে মৃণাল প্রতিবাদী হলেও সমাজ-সংস্কার ভেঙ্গে বের হতে পারেনি বিধায় বিন্দুর বিয়ে আটকানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অচেনা পাগল এক পাত্রের সঙ্গে বিন্দুর বিয়ে হয়। পাগল স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পেতে বিন্দু গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। সমাজ-সংসারের চাপিয়ে দেয়া নিয়ম বিন্দু মেনে নিতে পারেনি। এই নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে সে। তার প্রতিবাদ তাকে অনন্ত পথের যাত্রী করেছে। তাই মৃণাল জানায়:

> মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান- সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত। (ঠাকুর, ২০১১: ৩৩৫)

বিন্দুর আত্মহনন পলায়ন মনোবৃত্তির পরিচয় বহন করেনা। তার মৃত্যু নির্যাতিতা নারীর দৃপ্ত প্রতিবাদের পরিচয় বহন করে। বিন্দুর প্রতি হওয়া অত্যাচার ও তার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সংসারের প্রতি মৃণালের ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাই মৃণালের বিদ্রোহ নিজের জীবনের কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার জন্য নয়। বিন্দুর মৃত্যুর পর মৃণাল সংসারে মেয়ে মানুষের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাই সংসারে মেয়ে হয়ে আর না ফিরে সৃষ্টিকর্তার সেবায় নিজেকে সমর্পণ করে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চেয়েছে। সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মৃণাল গর্জে উঠেছে আপন তেজে। স্বামীর চরণতলের আশ্রয় ছিন্ন করে মৃণাল স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে:

> "তোমাদের গলিকে আমি আর ভয় করি নে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।... মরেছে মেজোবউ। তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি- ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল- তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্য মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল প্রভু- তাতে তার যা হবার হোক।' এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা। আমিও বাঁচব। আমিও বাঁচলুম। (পৃ. ৩৩৫)

পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ ঠিক কতটুকু তেজস্বী হতে পারে তা রবীন্দ্রনাথ মৃণালের এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। মৃণালের সংসার ত্যাগ মানে নতুন করে বাঁচার পথের সন্ধান করা। তার সংসার ত্যাগ সমাজের খারাপ প্রথার উপর জোর চপেটাঘাত। তার মতো সাহসী নারীরাই সমাজকে পরিপূর্ণ অস্বীকার করে, বিদ্রোহ ঘোষণা করে নতুন পরিচয় নিয়ে আজকের সমাজে টিকে থাকতে পারবে। *স্ত্রীরপত্র* গল্পে মৃণালের প্রতিবাদী সত্তার জাগরণ দেখে নীহাররঞ্জন রায় এর উক্তির কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন:

> 'স্ত্রীর পত্রে'র বিদ্রূপবাণ ব্যর্থ যায় নাই। প্রমাণ "নারায়ণ"মাসিক পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের 'মৃণালের পত্র' এবং ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'স্বামীর পত্র' নামক দুই প্রতিবাদ। প্রমাণ, পরবর্তী যুগের সাহিত্যে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর বিদ্রোহবাণী। (রায়, ১৩৪৮: ৩৭৬)

আবহমান বাঙালি নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে মৃণালের এই প্রতিবাদের ভাষাই হোক বাঙালি নারীর হৃদয়ের ভাষা। সমাজের বদ্ধমূল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বাঙালি নারীকে হতে হবে মৃণালের মতোই তেজস্বী ও বিদ্রোহী।

অপরিচিতা (১৯১৪) গল্পটিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্থক একটি প্রতিবাদী গল্প। গল্পটিতে কল্যাণী নামের এক প্রতিবাদী নারীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। অমানবিক পণ প্রথার বিরুদ্ধে কল্যাণী ও তার পিতা শম্ভুনাথ সেনের যৌথ বিদ্রোহের চিত্র পাওয়া যায় এই গল্পে। গল্পে দেখা যায়, বিয়ের আসরে বরের মামা পাত্রীর গায়ের স্বর্ণের গহনা খুলে নিয়ে ওজন করছে। ওজন করার হেতু, কন্যাপক্ষ যৌতুক ঠিকমতো দিয়েছে কিনা তা যাচাই করা। এই ঘটনায় উচ্চশিক্ষিত অথচ ব্যক্তিত্বরহিত বর অনুপম প্রতিবাদ জানায়নি। শম্ভুনাথবাবু নিজের মেয়ের বিয়েতে বরপক্ষের এমন নিচু মানসিকতা ও ঘৃণ্য আচরণ দেখে প্রীত হতে পারেননি। বরপক্ষের বিশ্বস্ততার অভাবজনিত কারণে এবং যৌতুক নিয়ে নারীদের অবমাননা করলে শম্ভুনাথ সেন কন্যা সম্প্রদানে অসম্মতি জানায়। কন্যার লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শম্ভুনাথ সেনের বলিষ্ঠ প্রত্যাখান গল্পটিকে সার্থক করে তুলেছে। কল্যাণীও শিক্ষিত সমাজের নারী প্রতিনিধি হয়ে সামাজিক রীতি-নীতি ও বাধ্যবাধকতার বাইরে এসে বিনা দ্বিধায় উচ্চারণ করেছে : "আমি বিবাহ করিব না।" (ঠাকুর, ২০১১: ৩৫৩) কল্যাণীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জাগরণ, সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ এবং ভবিষ্যতে নতুন রূপে নারীর আগমনের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে গল্পের সমাপ্তি ঘটে। এক্ষেত্রে সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য:

> কল্যাণীই, গল্পের ক্ষেত্রে প্রথম দেশকে 'মা' ডেকেছে। বিয়ে না করবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে জবাব দিয়েছে 'মাতৃ-আজ্ঞা'।... শিক্ষিত বাঙালি যুবতীর দলবল নিয়ে ট্রেনে চেপে অসংকোচ খাওয়া দাওয়া, স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে তর্ক- এসব নতুন দিনের সংকেত। (উদ্দীন, ১৯৭৮ : ১৯৫)

রবীন্দ্রনাথের এই গল্পে পণ প্রথার বিরুদ্ধে কল্যাণীর প্রতিবাদী সত্তা এবং একইসাথে দেশচেতনায় ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘটেছে সুনিপুণভাবে।

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে *পয়লা নম্বর* (১৯১৭) অত্যন্ত সিদ্ধ একটি প্রতিবাদী গল্প। গল্পের কাহিনি পারিবারিক হলেও সামাজিক চেতনায় তা ভরপুর। এই গল্পের নায়িকা অনিলা। অনিলা বিদ্রোহিনী নারীর প্রতীক। তার স্বামী অদ্বৈতচরণ বিদ্যা-বুদ্ধির চর্চায় বুঁদ হয়ে থাকে ও নিজের দলবল নিয়ে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত সময় পার করে। স্ত্রীর চাওয়া-পাওয়ার প্রতি তার ন্যূনতম ভ্রুক্ষেপ নেই। এমনকি অনিলার সুমধুর গানের গলার কদরও করেনি কখনও। অদ্বৈতচরণের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিলো যাকে একবার স্ত্রী হিসেবে পাওয়া গিয়েছে তখন সেই স্ত্রী বর্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। স্ত্রী সম্পর্কে এর চেয়ে অধিক ভাবনা তার মধ্যে ছিলনা। স্বামীর এরূপ অবহেলার মধ্যেই অনিলার জীবনে আবির্ভাব ঘটে সিতাংশুমৌলির। একদিকে স্বামীর অবহেলা, অন্যদিকে সিতাংশুর প্রেমের উত্তাল আহ্বান। অনিলা এসব থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছে। তাই, "অনিলা উদাসীন স্বামীর গৃহ ত্যাগ করেছে, কিন্তু তার স্তব-ধন্য ঐশ্বর্যময় হৃদয়ের অধিকারী সিতাংশুও তার সাক্ষাৎ পায়নি, এমনকি সাড়াও পায়নি।" (উদ্দীন, ১৯৭৮ : ১৯৮) অদ্বৈতচরণ অনিলাকে দেখেছে সাংসারিক সীমারেখায় নিজের প্রয়োজনে। অপরদিকে সিতাংশু তাকে দেখেছে লুব্ধ দৃষ্টিতে। এই বিষয়ে সমালোচকের বিবৃতি:

> লেখক অনিলাকে এই দ্বন্দ্ব থেকে অকস্মাৎ সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবজীবনে এই দুর্ঘটনা স্ত্রীর প্রতি উদাসীন স্বামীদের সতর্কতা অর্জনের অভিজ্ঞান হয়ে থাকল। দাম্পত্য জীবনে এই বিরোধ ও ব্যর্থতা আমাদের সমাজের চিরন্তন সংস্কারেরই বিষময় ফল। (উদ্দীন, ১৯৭৮ : ১৯৭)

অনিলা স্বামীর প্রতি তীব্র অভিমান, পুরুষতন্ত্রের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা দেখিয়ে তাদের অবমাননা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে সংসার থেকে পালিয়ে নীরব তিরস্কার করেছে। স্বামীগৃহ থেকে নিরুদ্দেশ হওয়ার পূর্বে স্বামী ও সিতাংশু দুজনকেই চিঠিতে বলে গিয়েছে : "আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খোঁজ পাবে না।" (ঠাকুর, ২০১১: ৩৬৪) নারীর বন্ধনমুক্তির এই আকাঙ্ক্ষা নিঃসন্দেহে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে এক প্রদীপ্ত প্রতিবাদ। অনিলার এই অন্তর্ধান নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তার নীলখামের চিঠি অপরিমেয় যাতনার প্রতীক। এই যাতনা ও বেদনাই স্বামীর উদাসীনতা ও সিতাংশুর ভাবুক রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। দুই মেরুর সংকট নিরসনের জন্য সংসার থেকে পালিয়ে অনিলা হয়তোবা আত্মহত্যা করে। মিথ্যার জগৎ থেকে বের হয়ে অনিলা সত্য প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছে। পুরুষের লাঞ্ছনা, অপমান আর কামুক নেশা থেকে মুক্তিকামী নারীর চূড়ান্ত প্রতিবাদ অনিলার সাহসিকতার মধ্য দিয়েই এই গল্পে রূপায়িত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজদৃষ্টি সামাজিক জীবনের ব্যাপকতার অনুসন্ধানী। সামাজিক নানা প্রথার বিরুদ্ধে নারীদের নীরব প্রতিবাদী সত্তা, প্রকাশ্য প্রতিবাদ কিংবা তিরস্কারের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিখুঁতভাবেই তাঁর ছোটগল্পের নারী চরিত্রগুলো নির্মাণ করেছেন। আলোচনায় প্রতীয়মান হয় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ এসেছে বিচিত্ররূপে, ভিন্ন কারণে। নারীরা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে গেড়ে বসা পণপ্রথা, বিয়ের রীতি-নীতি, সংসার-ধর্ম, শ্বশুর বাড়ির অনাদর, অত্যাচার, অর্থলোলুপতা, সমাজ ও মানুষের নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা প্রভৃতি বিচিত্র সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে। প্রতিবাদী নারীরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সংকীর্ণ সমাজের বাইরে বের হয়ে নিজেদের জীবনকে করে তুলেছে মহিমান্বিত। জীর্ণ সমাজব্যবস্থায় নারীরা অপমান-লাঞ্ছনা ও দুঃখকে জয় করে প্রতিবাদে মুখর হয়ে মুক্তির সন্ধানে নবজীবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে নারী প্রতিবাদের যে মিছিল, তার প্রত্যেকটিই নবজীবনের আলোকশিখায় উদ্ভাসিত। নারীর এই প্রতিবাদ সমাজের বিবেককে নাড়া দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে দিয়েছে। সমাজে আজ নারী ব্যক্তিত্ব শক্তভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজ প্রোথিত সংস্কার নারীকে আর পঙ্গু বা জব্দ করতে পারবে না। মুক্তির মর্মসুধা পান করে প্রতিবাদী নারীরা মুক্তির পথের সন্ধান পেয়েছে। রবীন্দ্র ছোটগল্পে নারীরা যথার্থ জীবনবোধের স্বরূপ উন্মোচন করেছে প্রতিবাদের মাধ্যমে। সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ ও নারী মুক্তি আজ একই স্রোতে বহমান। আপন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে গিয়েই নারীরা প্রতিবাদী হয়েছে। করুণার পাত্রী হয়ে নারীদের পুরুষের নিগ্রহ ভোগ করার দিন শেষ হয়ে এসেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের নির্যাতনের মুখে নারীরা আজ সংগ্রামী। রবীন্দ্রনাথের এই নারী চরিত্রেরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সমাজে তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় প্রয়াস চালিয়েছে। প্রতিবাদের ভাষা ব্যবহার করে পুরুষ সমাজের নীচতা ও হীনতার প্রতি ধিক্কার জানিয়েছে। প্রতিবাদী নারীরা বুঝিয়ে দিয়েছে এই সমাজ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন নয় বরং সমাজেরই পরিপূরক। মানুষ হিসেবে নারীরা স্বতন্ত্র। প্রতিবাদী নারীদের মূল অনুপ্রেরণাই হলো নারী মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে রূপায়িত সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ নারীকে দিয়েছে স্বতন্ত্র ও মুক্ত জীবনের সন্ধান।

তথ্যসূত্র:

1) উদ্দীন, মুহম্মদ মজির, রবীন্দ্র-ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশ-চেতনা, ঢাকা : সিটি লাইব্রেরী। ১৯৭৮।
2) ঘোষ, বিশ্বজিৎ, অশেষ রবীন্দ্রনাথ, ঢাকা: নান্দনিক, ২০১৪।
3) চক্রবর্তী, অজিতকুমার, গল্পগুচ্ছের পুনর্মূল্যায়ন, কলকাতা : আলফা পাবলিশিং কনসার্ন, ১৩৮৯।
4) চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, সাহিত্য-প্রবন্ধ: প্রবন্ধ সাহিত্য (সম্পা.কৃষ্ণগোপাল রায়), কলকাতা: বঙ্গীয়সাহিত্য সংসদ।
5) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, ঢাকা : মৌ প্রকাশনী, ২০১১।
6) দাশ, শিশিরকুমার, বাংলা ছোটগল্প, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৩।
7) দাশগুপ্ত, প্রশান্তকুমার, 'দেনা-পাওনা: বিষামৃতের ফসল', আন্তর্জাতিক ছোটগল্প ও সমাজ জিজ্ঞাসা (সম্পা.সুখেন ভট্টাচার্য), কলকাতা : প্রতিভাস, ১৯৯০।
8) মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর, মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ও অন্যান্য, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০০৭।
9) রায়, নীহাররঞ্জন, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৩৪৮।